মৃত্যুযজ্ঞ

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

—ওরকম যেতে পারবো না বললে হবে না! এরকম নতুন চাকরি, সেখানে এরকম না বললে ব্যাপারটা কোথায় গড়াবে আপনি বুঝতেই পারছেন না।

ফোনের এ প্রান্তে এখন নীরবতা।

ওপ্রান্তে যিনি কথা বলছিলেন তিনি মনে হয় বুঝলেন যে এতোক্ষণ উনি যা বোঝাচ্ছিলেন এ প্রান্তে যিনি শুনছিলেন তিনি সেটা বুঝেছেন। তাই একটা স্বস্তির ভাব নিয়ে বললেন, তাহলে সব ঠিক আছে, অরিত্রাকে পরশু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে বলবেন, অফিসের গাড়ি আপনাদের বাড়িতে চলে যাবে, এই সকাল আটটা সাড়ে আটটায়, ও যেন তৈরি থাকে, আর খবরটা করতে ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে সব ব্যবস্থা করা আছে, এখন এই অবস্থায় এই ধরনের খবর করতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে যে সব সমস্যা আসে আপনি সে ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন তো, সেরকম ভয়ের কিছু নেই, স্থানীয় পঞ্চায়েতে ভালো যোগাযোগ আছে এরকম একজনকে সব বলা আছে, সেই যে লোকগুলো মারা গেছে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে, মৃতদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, অরিত্রাকে শুধু তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে, সঙ্গে কাগজের স্টাফ ফোটোগ্রাফার থাকবে, আর বর্ধমান তো ঘরের কাছে, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসবে...

অনেকক্ষণ এ-প্রান্ত থেকে কোনো কথা নেই বলে ও-প্রান্ত থেকে সামান্য সংশয় ছোঁয়া কণ্ঠ বলল, কি হলো শুনছেন তো...

এ-প্রান্তের কণ্ঠ সামান্য লজ্জা ভেজা স্বরে বলল, না, না, শুনছি, আসলে আমি একটা অন্য কথা বলতে চাইছিলাম...।

এ-প্রান্তের কথা পুরো শেষ হতে পারল না, ও-প্রান্ত তাকে মাঝপথেই কেটে দিল, বলল, আপনি কি বলবেন আমি জানি, প্রিকশানের কথা বলবেন তো? অফিসের গাড়িগুলো সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে প্রতিদিন স্যানিটাইজড় করা হয়, বাজারে অনেক ডিসইনফেকট্যান্ট চলছে, কোনটা যে কতটা খাঁটি কে জানে! যে কেমিক্যালটার নাম বললাম ওটা যদি না থাকে তবে সেটা কোনো কাজের নয়, আর আমাদের কাগজের তরফ থেকে কর্মীদের যে মাস্ক দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু অরিজিনাল এন-নাইনটি ফাইভ, স্যানিটাইজার কিন্তু বাজারে যে হরেক মাল দশটাকা সেই গোত্রের নয়, একেবারে ওষুধের কোম্পানি থেকে আনা...। টানা বলে যাওয়ায় ও-প্রান্তের দমে বোধহয় ঘাটতি পড়েছিল। তাই বিরতি।

সেই সুযোগে এ-প্রান্ত বলল, আমি এগুলো জানি, আমি এসব নিয়ে ভাবছি না,

আমি যেটা বলতে চাইছিলাম তা হল—

এ-প্রান্তকে আবার কেটে দিল ও-প্রান্ত। এবার স্বর বেশ কঠিন। বললেন, আপনি বোধহয় অফিসে আমার পজিশনটা কি সেটা জানেন না, আমি কিন্তু কারুর সঙ্গে এতো কথা বলি না, আপনার মেয়ে জানে, এতো কথা কেন বলছি জানেন? আমার রেফারেন্সে অরিত্রাকে নেওয়া হয়েছে, ও যদি অ্যাসাইনমেন্টটা করতে না যায় এডিটরের কাছে আমার পজিশনটা কি হবে আপনি বুঝতে পারছেন না, আমার পজিশনের কথা নয় বাদই দিলাম, অরিত্রার চাকরিটার কি হবে বুঝতে পারছেন? লকডাউনের মধ্যে সব সংস্থা কর্মী ছাঁটাই করছে আর সেখানে নিজের থেকে কেউ যদি কোনো কাজে না বলে সেখানে তো তাকে ছেঁটে ফেলতে মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধাবোধ করবে না হাউস...

ফোনটা কেটে গেল। এ-প্রান্ত বুঝল ও-প্রান্ত এতোটাই বিরক্ত যে উত্তরের অপেক্ষা করল না।

অরিত্রার ঘুম ভেঙে গেছে। খুব ঘুমিয়েছে অরিত্রা। কাল অফিস থেকে ফিরে এই অ্যাসাইনমেন্টটার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষগুলোর কথা ভেবে ওর ভাবনার মধ্যে যে বিষাদ উঠে আসছে, মন ভালো না লাগায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সেইসব কথা বলেছিল। কোনও রকমে শেষ করেছিল রাতের খাওয়া। তারপর বিছানার দিকে যেতে যেতে বলেছিল, তুমি একটু শৌভিকদাকে ফোন করে বলো না আমাকে যেন এই অ্যাসাইনমেন্টটা না করতে হয়। অদ্রিতির উত্তরের অপেক্ষা করেনি অরিত্রা। বিছানায় প্রায় ধপাস করে পড়েছিল। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। অদ্রিতি ডাইনিং-এর দেয়াল ঘড়িতে দেখেছিল সাড়ে ন'টা। অন্যদিনের থেকে অনেক আগে ঘুমিয়ে পড়ল। এখন সকাল সাড়ে ন'টার রোদ এসে পড়েছে ডাইনিং টেবিলের ওপরে। অদ্রিতি ফোনে কথা বলছে শুনে অরিত্রা চলে এসেছে এখানে। কোনো সুরাহা হল কিনা জানার জন্যে ওর দু'চোখে প্রবল কৌতূহল। অদ্রিতি তাকাল মেয়ের মুখের দিকে। কত ঘুমিয়েছে অথচ মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে দেখল অরিত্রার চোখের নীচে লেগে রয়েছে মেঘলা দিনের আকাশ।

কৌতূহল ধরে রাখতে পারল না অরিত্রা, একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বলে উঠল, কী বলল শৌভিকদা?

ম্লান হাসলেন অদ্রিতি, কি আবার বলবেন! অ্যাসাইনমেন্টটা করতে হবে না হলে চাকরিটা তোকে ছাড়তে হবে...

—ছাড়তে হবে! বললেই হল!

—আরে বাবা আমি বলছি না, তোর শৌভিকদা বলল...

অদ্রিতি দেখলেন অরিত্রার চোখের নীচে পাতলা জমিতে মেঘ ঘন হল। আত্মজার এই উচাটন, এই ব্যথা দেখতে ভালো লাগছে না অদ্রিতির। মেয়ের মুখের

দিকে তাকালে নিঃশ্বাসে বাতাসের স্বল্পতা অনুভব করছেন। বললেন, আমি একটা কথা বলব, এতো যন্ত্রণায় না ভুগে তুই বরং চাকরিটা ছেড়ে দে...

মুহূর্তেই অরিত্রার চোখের নীচের পাতলা জমির ওপর থেকে ব্যথার মেঘ মুছে গেল। সেখানে অদ্ভুত এক ক্রোধ। ঝেঁড়ে বলে উঠল, ছেড়ে দেব মানে!

—ছেড়ে দিবি মানে ছেড়ে দিবি, যেমন ছাত্র-ছাত্রী পড়াচ্ছিলিস তেমন পড়াবি, আমাদের মা মেয়ের দিব্যি চলে যাবে...

—চলে যাবে! শুধু চলে যাওয়ার জন্যে জীবন! এতো পড়াশোনা করলাম কী জন্যে! আমি ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট মা, গোল্ড মেডালিস্ট, শুধু চলে যাওয়ার জন্যে আমার জীবন নয় মা, শুনলে না আদিত্যদা সেদিন কী বললো? জীবনে এমন কিছু করবি যার জন্যে চারপাশের মানুষ তোকে নিয়ে আলোচনা করবে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোক যেন তোকে দেখিয়ে বলে, দেখো দেখো কে যাচ্ছে, তবে তো তোর বেঁচে থাকার একটা মানে দাঁড়াবে...

এখন আশ্বিন, আশ্বিনের মেঘ পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যায়, তাই কি অরিত্রার চোখের নীচে পাতলা জমিতে মেঘের ছায়া এমন হাল্কা? কথা বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে গেছে যে ওর মুখে এই মুহূর্তে ক্লান্তি অবসন্নতা উদ্বিগ্নতার ছায়া অদ্রিতি দেখতে পাচ্ছে না। হাল্কা হেসে বললেন, তাহলে অ্যাসাইনমেন্টটা করতে যা, ওটা ঠিক ভাবে করতে পারলে তোর জায়গাটা পাকা হবে, পাকা হলে তুই পরের ধাপে এগিয়ে যেতে পারবি, এগিয়ে গেলে একদিন তুই সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাবি যে জায়গায় পৌঁছলে মানুষ মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে, তাহলে অ্যাসাইনমেন্টটা করতে যেতে ভয় পাচ্ছিস কেন!

—ভয় পাচ্ছি না মা, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, মানুষগুলো ওরকম ভয়ঙ্কর ভাবে মারা গেছে, এখন তাদের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে হবে, তাদের কাছে জানতে হবে ঐ ভয়ঙ্কর মৃত্যু তাদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে, এই জানতে চাওয়াটা ঐ মৃত্যুর থেকেও যে ভয়ঙ্কর মা।

মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অদ্রিতি এই মুহূর্তের কোনো ভয়ের ছবি দেখতে পেলেন না, অনেক দূরের একটা ভয়কে তিনি দেখতে পেলেন। বললেন, এই তোর শুরু, এখনই তোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই জগতে তুই থাকবি কিনা, এরপরে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে...

অরিত্রার ঠোঁট বোবা, চোখ বোবা। শব্দরা সব নিরুদ্দেশে।

অদ্রিতি বললেন, তোর ছাত্রছাত্রী পড়াতে ভালো লাগে না, সরকারি চাকরি পেয়েও নিলি না, এখন বলছিস এই ধরনের খবর করতে তোর খুব কষ্ট হয়, সাংবাদিকতা করতে গেছিস, কখন কোন খবর করতে হবে কিছু ঠিক আছে! তাহলে তুই করবিটা কী! কিছু ভাব, একটা সিদ্ধান্ত নে, সময় তো অনেক গেল...

সমাধান না হওয়া অসম্পূর্ণ শব্দছকের কাগজ যে রকম অভিব্যক্তিতে টেবিলের ওপরে ছুড়ে ফেলে মানুষ চলে যায় সেরকমই ডাইনিংস্পেস থেকে চলে গেল অরিত্রা।

দুই

আবির মুঠোয় তুলে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় যেমন মানুষ, তেমনই কে যেন সমগ্র পরিপার্শ্বে সবুজ ছড়িয়ে দিয়েছে। শেষ শ্রাবণের আকাশে জায়গায় জায়গায় মেঘ, কিন্তু যেখানে মেঘ নেই সেখানে কোনো বিখ্যাত টেক্সটাইলের ঘন ফিরোজা রঙের ওড়না উড়ছে। প্রকৃতিতে এমন পাগল করা সবুজ, আকাশে অমন নীল পৃথিবীতে কি আগে ছিল। কিছুদিন আগেও তো আকাশের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করত না। আকাশ দেখলে নাকি মানুষের মন, হৃদয় বড়ো হয়ে যায়, মহান হওয়ার পথে নিজের অবচেতনে সে নাকি এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন আগেও আকাশের দিকে তাকালে মহান হওয়া তো দূরের কথা অরিত্রার মনে হতো মানুষের মন সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। ধোঁয়াটে কালচে নীল রঙের আকাশ দেখলে মনে হতো আকাশের ফুসফুস জুড়ে ব্যাধি, প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হতো গাছেরা সব অ্যানেমিয়ায় ভুগছে। অথচ আজ এ কি দেখছে অরিত্রা! লকডাউনের জন্যে অনেক পেশাতেই এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম। কিন্তু তার সাংবাদিকতার পেশায় তো এটা হচ্ছে না। তাকে বাড়ি থেকে বেরতে হচ্ছে। তাহলে কি এই ক'দিনে সে আকাশ দেখেনি। প্রকৃতি দেখেনি? এ কি হতে পারে? নাকি কলকাতা শহরের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে দিল্লি রোড ধরে বর্ধমানের উদ্দেশে পাখির ডানায় যে চলমানতা থাকে সেই চলমানতায় তাদের গাড়ি ছুটছে বলে প্রকৃতি এমন ভাবে ধরা দিচ্ছে?

অরিত্রার ভেতরের দ্বন্দ্ব প্রশ্ন হয়ে বেরিয়ে এলো। পেছনের সিটে স্বল্প তফাতে বসে থাকা তাদের কাগজের স্টাফ ফোটোগ্রাফার নিলয়কে প্রশ্নটা করে ফেলল অরিত্রা।

নিলয় হাল্কা হেসে বলল, যা বলেছেন দিদি, প্রকৃতি যে এতো রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে...

—আচ্ছা প্রকৃতির কি এটা উচিত হচ্ছে? কথাটা বলে ফেলে অরিত্রার নিজেকেই নিজের কিরকম বোকাবোকা লাগল।

নিলয়ের চোখে হাসি মুছে গেছে। সেও অরিত্রার এই প্রশ্নের কোনো মানে খুঁজে পায়নি। আমতা আমতা স্বরে বলল, ঠিক বুঝলাম না দিদি...

মুহূর্ত চুপ করে থাকল, তারপর হতাশ স্বরে বলল, চারপাশে এতো মানুষ মরছে, কাল কে হাসপাতালে ভর্তি হবে কে হবে না কেউ জানে না! প্রতি মুহূর্তে একটা আতঙ্ক, একটা উদ্বেগ আমাদের সঙ্গী, সেখানে প্রকৃতির এরকম সেজে ওঠার কোনো

মানে আছে কি?

এবারে নিলয় কোনো উত্তর দিল না।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অরিত্রা বুঝল এই মুহূর্তে নিলয়ের ভেতরে যাবতীয় শব্দ হারিয়ে গেছে। বলল ধরো তোমার কোনো প্রিয়জন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে,ডাক্তার বলে দিয়েছে বাঁচার কোনো আশা নেই, এরকম একজনকে কিন্নরকিন্নরী থেকে কেনা কাঁথাস্টিচের একটা পাঞ্জাবি পরে তুমি দেখতে গেছ, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে?

মুহূর্ত আগে নিলয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অরিত্রার মনে হয়েছিল ওর ভেতরে যাবতীয় শব্দ হারিয়ে গেছে, এখন মনে হল শব্দরা শুধু হারিয়ে যায়নি, ওর শরীরেরর যাবতীয় স্নায়ু পাথরের হয়ে গেছে।

অনেক কষ্ট করে নিলয় যেন ওর স্বরযন্ত্রটিকে চালু করল। বোকাবোকা এক হাসি দুচোখে ভাসিয়ে বলল, আমি কখনও এসব ব্যাপারে এভাবে ভাবিনি, মানে এসব কথা আমার ভাবনায় আসেনি, আপনি অনেক বড়ো, কত পড়াশোনা করেছেন, আপনার ক্যালিবার আর আমার!

হেসে ফেলল অরিত্রা, হাসতে হাসতেই বলল, এভাবে ভাবতে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয় না? অনেক ক্যালিবার লাগে?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না নিলয়। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অরিত্রা বুঝল ওর ভেতরটা হাকুশ তেঁতো হয়ে গেছে। গাড়ির ভেতর থেকে দৃষ্টি ও বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে।

আবার ঝটকা মেরে দৃষ্টি বাইরের দিক থেকে গাড়ির ভেতরে ফিরিয়ে আনল নিলয়, বলল, আপনি যাই বলুন না কেন আমার ক্যামেরার খুব খিদে মিটছে এই ক'মাসে...

বেশ কৌতূহল নিয়ে অরিত্রা বলল, কিরকম?

খুব উৎসাহ ভরে হাসল নিলয়, বললো, কি বলাবো দিদি আমি যেখানে থাকি সেদিকে তো কাক শালিখ চড়াই ছাড়া অন্য কোনো পাখি কোনোদিনও দেখিনি, অন্য পাখি যা দেখেছি সব কম্পিউটারে ইন্টারনেটে, যখন যেটার প্রয়োজন হয়েছে তখন ঐ নেট থেকে কপি করে সাপ্লাই দিয়েছি, এবার আর তার প্রয়োজন হবে না, আমার নিজস্ব স্টক থেকে দিতে পারবো...

—ও মা তাই! খুব উৎসাহ নিয়ে বলে উঠল অরিত্রা।

—হ্যাঁ দিদি, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, চন্দনা এরা সব আমাদের পাড়ায় বড়োবড়ো গাছগুলোতে সকালে এসে বসে...

—তাই!

—হ্যাঁ দিদি, শুধু কি পাখি, কত কাঠবিড়ালি, প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়,

সেদিন দেখি একটা কাঠবিড়ালি আর একটা চন্দনা নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে...

এতোক্ষণ নিলয় শব্দ হারিয়ে ফেলেছিল, এবার অরিত্রা হারিয়ে ফেলছে। নিলয় কি বুঝেছে সে ঐ জানে, বলল দিদি এইসব পাখি, পশুপাখিদের এইসব ঘটনা দেখার জন্য বার্ডওয়াচার, অ্যানিমেলওয়াচাররা জঙ্গলে গিয়ে ক্যামেরার লেন্সে চোখ আটকে দিনের পর দিন হা পিত্যেশ করে বসে থাকে, সেখানে এখন দরজা খুলে বাড়ির বাইরে পা রাখলে দেখা যাচ্ছে...

নিলয়ের মুখের দিকে সরাসরি তাকাল না অরিত্রা। মানে তাকাতে পারল না। তার মানে এই যে এখন চারপাশে ঘটে চলা মৃত্যুযজ্ঞ,প্রতি মুহূর্তের শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া আতঙ্ক—এগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো মানে হয় না। এনিয়ে কোনো নেগেটিভ ভাবনা মনের মধ্যে আসা উচিত নয়। এই ঘটনা আসলে পৃথিবীর, প্রকৃতির আড়ালে চলে যাওয়া সুন্দরকে সামনে নিয়ে আসছে, এ তো আসলে একটা শুভ ঘটনা। ঠিক এই জায়গায় এসে আর ভাবতে পারল না অরিত্রা। গাড়ি যেমন সাটেলব্রেক কষে, ভাবনা যেন সেরকমই ব্রেক কষলো।

নিলয়ের মুখের দিকে সরাসরি তাকায়নি অরিত্রা, তাকাতে পারেনি, কিন্তু তাকাতে খুব ইচ্ছে করছে। তাকানোর জন্যে সামনের সিটের ড্রাইভারের বাঁ হাতের ওপর দিকে ঝোলানো রিয়র ভিউ মিরারে চোখ রাখল। নিলয়ের মুখটা আংশিক দেখা যাচ্ছে, তবে চোখ দুটি খুব স্পষ্ট। সেই চোখে অনেক কিছু পেয়ে যাওয়ার একটা খুশি লেগে রয়েছে। ওদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল অরিত্রা। মনে এল একটা অন্য কথা, আচ্ছা আজ রাতে নিলয়কে যদি ওর খুব কাছের কোনো মানুষকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হয়, তার যদি কোভিড পজেটিভ থেকে প্রবল শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, যদি হাসপাতালে সহজে ভর্তি করাতে না পারে, যদি এ হাসপাতাল থেকে ও হাসপাতালে, ও হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতালে ছুটতে হয়! তখন কি ওর ঐ মাছরাঙা কাঠঠোকরা চন্দনাদের কথা মনে পড়বে? তখন কি ওর ভাবনায় কাঠবিড়ালিটার সঙ্গে চন্দনার খুনসুটির কথা ভেসে উঠবে?

কিছুই সঠিক করে বুঝতে পারে না অরিত্রা। শুধু মনে হচ্ছে, অদ্ভুত বিচিত্র এক কিম্ভূত সময়ের মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। বাঁদিকে গেলে সত্যের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঠিক তার উল্টোদিকে, মানে ডানদিকে গেলে সত্যের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এরকম কখনও হয় নাকি! হয় কিনা জানে না অরিত্রা, কিন্তু এইরকমই একটা রেশ শুধু উঠে আসছে অনুভবের কোষে কোষে।

নিলয় বলল, এবারে না আমাদের পেয়ারা গাছটায় ফুল এসেছে...

অরিত্রা নিলয়ের দিকে তাকাল না। ভেতরে ভেতরে বেশ অবাক হল। ওর হয়তো পড়াশোনা খুব একটা নেই, ভাবনার গভীরতাও হয়তো খুব একটা নেই। কিন্তু ও তো বেশ কিছুদিন ধরে এরকম একটা নামি দৈনিক খবরের কাগজে স্টাফ

ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছে! ওর তো বোঝা উচিত কোন কথাটা বলার মতো আর কোনটা নয়! বেশ একটা উষ্মা নিয়ে বলল, তো...

—সাত বছর পরে।

এবার অরিত্রার বোবা হওয়ার পালা। হলও তাই।

নিলয় বলল, জানেন দিদি, আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে এগ্রিকালচার নিয়ে মোহনপুরে পড়ছে, ও গাছটার দিকে তাকিয়ে বলছিল, দেখেছিস পলিউশান লেবেল কমে গেছে বলে গাছটা তার পুরনো প্রাণশক্তি কিরকম ফিরে পেয়েছে!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অরিত্রা, বলল, হ্যাঁ লকডাউনে গাড়ি কম চলছে পলিউশান তো কমবেই, গাছটা ওর প্রাণশক্তি ফিরে পেল আর আমাদের পাড়ার লক্ষ্মণের প্রাণটা গেল, সাতাশ বছর মাত্র বয়স, কি চেহারা ছিল...

—কী করে!

—ও একটা বাচ্চাদের স্কুলে গাড়ি চালাতো, স্কুল তো সব বন্ধ, ওর কাজ ছিল না, গলায় দড়ি দিল...

এবার কোনোদিক থেকেই কোনো শব্দ নেই।

অরিত্রাই গাড়ির ভেতরের বাতাসকে স্বাভাবিক করার দায়িত্ব নিয়ে নিল। এই ক'দিন কাজ করতে গিয়ে বুঝেছে স্টাফ ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক রাখা জরুরি। কোনো কথা কে কিভাবে নেয় কে জানে। নিলয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক হেসে অরিত্রা জিজ্ঞেস করল, আর কতদূর গো বনমালীপুর...

নিলয় হেসে বলল, আর বেশি দূর নয় দিদি, এইতো কনসারিপুর মসজিদের রাস্তাটা ফেলে এলাম, সামনে গুড়াপ আসছে, গুড়াপের আগে ডানদিকে আমরা ঘুরে যাবো...

নিলয়ের কণ্ঠের স্বাভাবিকতা অরিত্রাকে বলে দিল সব ঠিক আছে, ও কিছু মনে করেনি, আর অরিত্রাও যে ব্যাপারটা, মানে যুক্তি কাউন্টার যুক্তির ব্যাপারটাকে মনের ভেতরে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি বোঝানোর জন্যে বলল, এই জায়গাটা কি তোমার চেনা, যেরকম ডিটেলসে বলছো...

নিলয় হাল্কা হাসল, বলল, না, না, আমিও এ পথে আপনার মতো প্রথম, তবে মৃতের পরিবার শৌভিকদার মোবাইলে যেরকম ডিটেলসে পথনির্দেশ দিয়ে দিয়েছে তাতে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না...

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। নিলয়ের কথা কেটে না দিয়ে পারল না অরিত্রা। যে মারা গেছে তার ফ্যামিলি থেকে শৌভিকদাকে রুটম্যাপটা দেওয়া হয়েছে!

—শৌভিকদা তো আমাকে পথনির্দেশটা দেওয়ার সময়ে সেরকমই বলল, লোকাল থানায় ফোন করেছিল, অফিসার একজনের ফোন নম্বর দেয়, শৌভিকদাকে অবশ্য সেই নম্বরে ফোন করতে হয়নি। ঐ নম্বর থেকে শৌভিকদার

কাছে ফোন আসে, ভদ্রলোক নাকি যে মারা গেছে তার মাসতুতো দাদা, তিনি রুটম্যাপ দিয়ে দিয়েছেন, মৃতের বাড়ির লোকজনদের সব বলেও রেখেছেন,এমন কি দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে...

নিলয়কে থামিয়ে দিল অরিত্রা। থামিয়ে দিতে বাধ্য হল। নিলয়ের কথা শুনতে পারছে না অরিত্রা। জাস্ট শুনতে পারছে না। এ কি! তারা কি কোনো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে নাকি! নাকি কোনো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রূপে যাচ্ছে! এক বীভৎস্য মৃত্যু আর সেই মৃত্যুর ফলে মৃতের নিকটজনদের মানসিক অবস্থা কি তারই সাক্ষাৎকার নেবে, সাব এডিটর শৌভিকদা বলেছিল হার্ড নিউজ পড়তে পড়তে পাঠক নিউজের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে, তার থেকেও বড়ো কথা সকালে কাগজ হাতে আসার আগে গতদিন সন্ধ্যেবেলায় হার্ড নিউজ অধিকাংশই মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে, তাই এটা হবে হিউম্যান ইনটেরেস্ট স্টোরি, খুব আবেগ দিয়ে লিখতে হবে। সবই শুনছিল, সবই বুঝছিল অরিত্রা, আর তার ভেতরটা বারবার ঝাঁকুনি খাচ্ছিল। ওরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে যাদের জীবনে তাদের সাক্ষাৎকার নেবে, আবেগ ঢেলে দিয়ে স্টোরি করবে, এর থেকে যন্ত্রণার তার কাছে আর কিছু নেই, এই যন্ত্রণায় গত কয়েকদিনে প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে ভুগেছে, মা বলছিল, একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ চোখের নীচটা কী হয়েছে, অথচ কয়েক মুহূর্ত হল নিজেকে কীরকম বোকাবোকা লাগতে শুরু করেছে, কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেসটা কী?

তিন

বাড়িতে কি কোনও অনুষ্ঠান আছে? নিলয় জিজ্ঞেস করেছিল ভদ্রলোককে। মানে অধীশ্বর পান্ডের দাদাকে। ভদ্রলোক অধীশ্বরের মাসতুতো দাদা নিখিলেশ পান্ডে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মেনরোডে। ধানক্ষেতের আল ধরে এখন এগিয়ে চলেছে ওরা। দুরের দিকে কলা সুপারি পেঁপে আরও নানান রকম গাছে ঘেরা টালির চালের একটা বাড়ি দেখিয়ে জানিয়েছে ওটা অধীশ্বরদের বাড়ি। কিন্তু চোখে পড়েছে বাড়ির সামনে বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ডেকরেটার্সের নীল সাদা কাপড় এতো চকচকে যেচোখে বিঁধছে।

নিলয়ের প্রশ্ন শুনে নিখিলেশ বলল,আজ তো অধীর জন্যে ত্রিপাদ দোষের যজ্ঞ হচ্ছে, তার জন্যেই ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে।

নিলয় আড়ষ্ট স্বরে বলল,আজ আপনাদের বাড়িতে কাজ আছে জানালে আসতাম না আমরা...

নিখিলেশ মা কালীর মতো জিভ কেটে বলল, সে কি কথা, আপনারা কাগজের লোক, আপনারা আসবেন আর আমাদের কাজ থাকবে সে কীরকম কথা। কত কষ্ট

করে কলকাতা থেকে আসছেন আর আমরা কাজ দেখিয়ে আপনাদের আসতে বারণ করব!

অরিত্রা এসব কথার কোনো মানেই খুঁজে পাচ্ছে না। এটা তো তাদের কাজ। কষ্টের কী আছে! বলল, সে কথা নয়, অন্যদিনও আসা যেত...

নিখিলেশ বলল, না, না, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, অধীর মারা গেছে প্রায় মাস খানেক হল, কোনো খবরই তো হচ্ছে না, সেই মারা যাওয়ার পরের দিন টিভিতে দু-তিনবার দেখাল ব্যাস তারপর তো আর কোনও খবরই নেই...

অরিত্রার ভেতরটা একটু টলে গেল। খবর করতে এলে ওরা কষ্ট পাবে ভেবে কষ্ট পেয়েছে। আর এখন বুঝতে পারছে খবর হওয়ার জন্য ওরা অধীর হয়ে রয়েছে।

উঠোনের ওপরে শামিয়ানার নীচে এসে দাঁড়াতে দেখল ছোটখাটো একটা ভিড়। কারুর মুখেই মাস্ক নেই। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং শব্দ দুটি এখানে সকলেরই বোধহয় অজানা। যজ্ঞ চলছে। কুঁজো হয়ে যাওয়া পুরোহিত ঘিয়ে ভিজিয়ে কাঠের টুকরো তুলে দিচ্ছে এক কিশোর ছেলের হাতে। আগুনের তাপে মুখ তার লাল হয়ে গেছে। রগের ওপর দিয়ে নেমে আসছে ঘামের ফোঁটা। ঘিয়ে ভেজান কাঠ সে দিয়ে দিচ্ছে যজ্ঞের আগুনে। খুব উৎসাহ নিয়ে তাকাল অরিত্রা আর নিলয়ের দিকে। অরিত্রার মনে হল আগুনের তাপ যে কষ্ট দিচ্ছে এই কিশোরকে তা যেন কমে গেল তাদের উপস্থিতিতে।

নিখিলেশ বলল, অধীর ছেলে, এবার মাধ্যমিক দিয়েছে।

পেছন থেকে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল একটি অল্প বয়সি মেয়ে। হাল্কা হেসে অরিত্রাকে বলল, পেছন বাড়িতে আপনাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে...

অরিত্রা নিখিলেশের উদ্দেশে খুব বিরক্তি নিয়ে বলল, না, না বসতে আমরা আসিনি, আপনি অধীশ্বরবাবুর বাবা মা আর স্ত্রীকে ডেকে দিন, ওনাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে, ওনাদের ছবি নেব, আমাদের কাজ শেষ...

পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, ওকথা বললে হবে না দিদি, আজ আমার স্বামীর ত্রিপাদ দোষ খণ্ডনের কাজ হচ্ছে, আজ এ বাড়ি থেকে শুধুমুখে চলে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে।

পেছনে তাকাতে অরিত্রা দেখল হলুদ আর রাণী কালারের ফুলে ছোপ ছোপ প্রিন্টের শাড়ি পরে এক মাঝবয়সি মহিলা তার দিকে মৃদু এক হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। স্বামী মারা গেছে বলে সাদাথান পরে তার পারলৌকিক কাজ করতে হবে একথা মানে না অরিত্রা। তবুও কেন জানে না ওনার শাড়ির হলুদ আর রাণীকালারের ফুলগুলো তার দৃষ্টিকে আঁচড়ে দিল।

অরিত্রা হেসে বলল, ত্রিপাদ দোষটা কী?

—আমরা এ ব্যাপারে ভালো করে কিছু জানি না, মানে ব্যাপারটা বুঝি না, ওর শ্রাদ্ধের দিনে ঠাকুরমশাই বললেন একেই অপঘাতে মৃত্যু তার ওপরে পঞ্জিকায় দেখলাম ঐ সময়ে ত্রিপাদ দোষ চলছিল, এর জন্যে শ্রাদ্ধের কাজের পরে আলাদা করে যজ্ঞ করতে হবে...

অরিত্রা অবাক হয়ে বলল, অধীশ্বরবাবুর মৃত্যুর সময়টা সঠিক করে আপনারা জানেন?

—না, জানবো কী করে! তিনদিন ধরে রেললাইন ধরে ওরা হাঁটছে তখন, ফোন করে যে কিছু জানাবে তারও উপায় ছিল না, মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে গিয়েছিল...

—তাই যদি হয় তবে ঠাকুরমশাই পঞ্জিকাতে সময়টা দেখলেন কিভাবে।

বোকাবোকা হাসল অধীশ্বরের বৌ, অত তো জানি না দিদি, ঠাকুরমশাই বিধান দিয়েছেন, বললেন এই দোষ না কাটালে সংসারে আরও অকল্যাণ হবে, ছেলেমেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে সংসার, যজ্ঞটা তাই না করে পারলাম না...

—ও। অরিত্রা বুঝল এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বলল,উনি ট্রেন লাইনে মাথা দিয়ে ঘুমচ্ছিলেন কেন?

—কি করবে দিদি, দু'দিন ধরে পথ হাঁটছিল, খাবার নেই, জল নেই, শরীর আর টানতে পারেনি, তা লাইন ধরেই তো হাঁটছিল, লাইনের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে, লাইনের লোহার পাতকেই বালিশ বানিয়ে নিয়েছিল।

—বালিশ!

—হ্যাঁ।

—আপনি জানলেন কী করে?

—নিবারণকে হাসপাতালে যারা দেখতে গিয়েছিল তাদের নিবারণ বলেছে।

—নিবারণও তো ওর সঙ্গে ছত্তিশগড় থেকে ফিরছিল, ওরা তো একই ঠিকাদারের কাছে লেবার খাটতো, নিবারণ অবশ্য বেঁচে গেছে, ট্রেনটা চলে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে ও লাফ মেরে ওপারের খাদানে পড়ে, ওর একটা পা বাদ গেছে...

এবারে কি প্রশ্ন করবে অরিত্রা বুঝতে পারছে না। ভাবনার স্ক্রিনে ভেসে উঠছে সেই খবর। ছত্তিশগড় থেকে পায়ে হেঁটে দু'জন শ্রমিক তাদের পশ্চিমবঙ্গের বাড়িতে ফিরছিল। রেললাইনের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ে। মালগাড়ির চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় একজনের শরীর।

অধীশ্বরের বৌ হাল্কা হাসি নিয়ে বলল, নিবারণ রেললাইনে শুতে আপত্তি করেছিল, আমার স্বামী বলেছিল, মাথায় বালিশের মতো কিছু না হলে ঘুমবো কী করে! দু'দিন ধরে হাঁটছি, আরও দেড় দিন মতো হাঁটতে হবে, একটু যদি ভালো করে না ঘুমোই হাঁটবো কী করে!

অরিত্রা কিরকম একটা মরিয়া ভাব নিয়ে বলে উঠল, ওরা যেখানে ছিল সেখানে থেকে যেতে পারতো না!

—চেষ্টা করেছিল তো, কিন্তু কত চেষ্টা করবে! লকডাউন হয়ে গেল বলে ঠিকেদার কোনো পেমেন্ট না করে ওর গ্রামের বাড়িতে চলে গেল, মুদিখানা সপ্তাহখানেক বাকিতে মাল দিয়েছিল, তারপর বন্ধ করে দিল, পেমেন্ট পাচ্ছে না দেখে বাড়িওলা ঘর থেকে বের করে দিল, হাসপাতালে থেকেছিল কয়েকদিন, টাকা পয়সা কিছু দেয়নি, তবে খেতে দিত, বদলে কোভিডের লাশ শ্মশানে নিয়ে যেতে হতো, সে কাজটাও তো পরে চলে গেল, ওখানকার ডোমেরা মারল, বলল, আর যদি হাসপাতালে দেখি জানে মেরে দেব, তারপরেই তো বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করল।

অরিত্রা আর শুনতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে এরকম একজনের বালিশ লোহা দিয়ে তৈরি হবে না তো কার হবে। অথচ অধীশ্বরের বৌ কী নির্বিকার ভাবে, ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে সব বলে যাচ্ছে। ঐ দু'চোখে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই। অধীশ্বরের মৃত্যুর থেকেও ঐ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকা বেশি মর্মান্তিক।

কারণে বা অকারণে যেমন হাসে অধীশ্বরের বৌ তেমনই হাসল, বলল, দেখেছেন কথায় কথায় আপনাদের জন্যে আনা সিঙাড়া মিষ্টি চা আনতে ভুলে গেছি, বসুন, আমি নিয়ে আসি...

—না। এতো জোরে এই শব্দটা বোধহয় এর আগে কখনও উচ্চারণ করেনি অরিত্রা। একটু থমকে গেল অধীশ্বরের বৌ। কিন্তু ঘাবড়াল না মোটেই। এবার ওর ঠোঁট নয়, চোখ হাসল। বলল, আপনাদের যদি ঠিক ভাবে আপ্যায়ন না করি তাহলে আপনারাই বা আমাদের কথা ভাববেন কেন!

—মানে!

—এর আগেও একটা কাগজ থেকে লোক এসেছিল, অনেক কিছু জানলো, বলেও ছিলাম, কিন্তু ফিরে গিয়ে একটা ছোট্ট খবর করলো, ঐটুকু খবরে কিছু কাজ হয়! হয়ওনি, আপনি কিন্তু খবরটা খুব বড়ো করে করবেন দিদি...

অধীশ্বরের বৌ নিজের দু'হাতের মধ্যে অরিত্রার হাত খপ করে ধরে ফেলল।

অরিত্রার মনে হল তার হাত দুটোর বদলে পা দুটো অধীশ্বরের বৌয়ের কাছে হতো তবে বোধহয় ও দুটোই ধরে নিত।

অসম্ভব চকচকে দুটো চোখ নিয়ে অধীশ্বরের বৌ বলল, ছত্তিশগড় সরকার পাঁচলাখ টাকা করে ঘোষণা করেছে, শুনছি আমাদের সরকার ফ্যামিলির একজনকে চাকরি দেবে, তা কিছুই তো হচ্ছে না, এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি, আপনি যদি খবরটা বড়ো করে করেন তবে কিছু একটা হতে পারে,

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে অরিত্রা।

অধীশ্বরের বৌ বলল, আমাদের ঘরবাড়ি তো সব দেখলেন, বেঁচে থাকতে তো ও কিছুই করতে পারেনি, এখন যদি...

এবারেও অরিত্রা কিছু বলতে পারল না। বাইরের উঠোন থেকে ঠাকুরমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে। অধীশ্বর ত্রিপাদ দোষ পেয়েছে। দোষ কাটাচ্ছেন ঠাকুরমশাই। কিন্তু কোথায় দোষ! অরিত্রা তো দেখতে পাচ্ছে অধীশ্বরের মৃত্যু পুরোটাই গুণের। বাইরে যে যজ্ঞ হচ্ছে সেটা মৃত্যু সম্পর্কিত যজ্ঞ। কিন্তু এ কীরকম সময়! মৃত্যুযজ্ঞের মধ্যে থেকে জীবনের ধোঁয়া উঠছে। অধীশ্বরের মৃত্যু যে এ বাড়িতে জীবন নিয়ে আসার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

অরিত্রা আর দাঁড়াল না। মানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।